খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এঁর -
শিক্ষা দর্শন

ভূমিকা: "মনুষ্যত্ব লাভ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক- এই ত্রিবিধ বৃত্তির সম্যক অনুশীলন আবশ্যক। শরীর, মন ও আত্মা প্রত্যেকেরই পুষ্টিসাধন হইলে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষাবাচ্য হয়। উদ্ভিদ বীজ যেমন- বায়ু, জল ও সূর্যতাপ সাহায্যে ফলবান বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, শিশুরাও সেইরূপ শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষাবলে পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করে"। (খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, রচনাবলী ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৪২৫)। একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ হিসেবে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)'র নাম সর্বজন বিদিত। দীর্ঘদিন শিক্ষা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি জীবনের বেশিরভাগ সময় শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষা ব্যবস্থার বিপুল সংস্কার সাধন করে গেছেন। তাঁর সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কিত তাঁর ভাবনা চিন্তা ছড়িয়ে আছে। পাকিস্তান সরকারের Education System Reconstruction কমিটিকে তাঁর দেয়া পরামর্শ; Calcutta Univercity Commission Report 1917-1919 "টিচার্স ম্যানুয়েল" ও "শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মুছলমান" গ্রন্থদ্বয় এবং কিছু প্রবন্ধে তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত দর্শন সন্নিবেশিত হয়েছে। এই বিস্তারিত বিষয় থেকে শিক্ষা ভাবনা সম্পর্কিত তাঁর বিশেষ কয়েকটি দিক সংক্ষেপে তুলেধরা হলো।

শিক্ষার উদ্দেশ্য কাঙ্খিত সমাজ গঠন: শিক্ষাবিদ, সমাজসেবক ও আধ্যাত্মিক সাধক খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) শিক্ষাভাবনা ও দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলো মানুষ এবং সেই মানুষের সার্বিক উন্নয়ন। তিনি মনে করতেন, সমাজে একজন মানুষের পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ থাকবে অবারিত। এই সমাজে একজন মানুষ হবে বিচক্ষণ, বিবেকবুদ্ধিচালিত এবং গঠিত হবে তার নৈতিক চরিত্র। সাধারণ নীতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সাধারণের ধারণায় থাকবে প্রেম, ত্যাগ ও সেবার মহান আদর্শ। মানুষের সব মূল্যবোধ বিবেচিত হবে আদর্শের মানদণ্ডে। এ সমাজের মানুষের স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে সাধারণ ধারণা থাকবে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালি হবে নিয়মিত ও বিজ্ঞানসম্মত, কুসংস্কারমুক্ত এবং কুপ্রথামুক্ত। জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের চর্চা ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির সুযোগ থাকবে। সমাজে মানুষ হবে দেশপ্রেমিক। আন্তর্জাতিক গতিশীলতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশের উন্নয়নের স্বার্থে সবাই হবে সজাগ ও সচেষ্ট। আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে অংশ নেবে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে। আধুনিকতার ছোঁয়া থাকবে শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে। তাঁর মতে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো- 'মনুষ্যত্ব লাভ'। আর মনুষ্যত্ব লাভ করতে হলে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক– এই ত্রিবিধ বৃত্তির সম্যক অনুশীলন আবশ্যক। শরীর, মন ও আত্মায় প্রত্যেকেরই পুষ্টি সাধন হলে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষাপদবাচ্য হয়। শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব একজন মানুষকে মানবসম্পদে পরিণত করা। শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব একজন মানুষের মধ্যে আত্মোপলব্ধি জন্মানো, আত্মবিশ্বাসী প্রত্যয়ী একজন মানুষ করে গড়ে তোলা। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান ও শক্তি উভয়ই পরিপূর্ণতা লাভ করে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও লিখেছেন– 'জ্ঞান লিপ্সাকে বর্দ্ধিত করিয়া মানসিক শক্তিকে পরিচালনা করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য।' (খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, রচনাবলী ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৪২৬)।

শিক্ষার বিষয়বস্তু: সমাজের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় সাধারণ বিষয়গুলো, যেমন– ভাষা-সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ধর্ম ইত্যাদি বিষয় পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে তাঁর ছিলো অভিন্ন অভিমত। প্রতিটি বিষয় নির্বাচন, পাঠ্যসূচি নির্বাচন, পাঠ্যপুস্তক রচনা, পাঠদানপদ্ধতি সবই লক্ষ্যমুখীকরণের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। সমাজের একজন মানুষকে সুন্দরভাবে জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্তকরণ সম্পর্কে হজরত খান বাহাদুর

আহ্ছানউল্লা (র.) অত্যন্ত বাস্তবতাবাদী মতাদর্শের অধিকারী ছিলেন। ইতিহাস পাঠকে শুধু অতীত অধ্যয়নের বিষয় হিসেবে না দেখে একে কার্যকর চেতনাদাত্রী হিসেবে ভাবা আবশ্যক মনে করতেন তিনি। তিনি তার 'ইসলামের ইতিবৃত্ত' বইয়ের স্কুল সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন– "ইসলামের ইতিবৃত্ত কতকগুলি ঘটনা বা সন তারিখের তালিকা নহে। ইসলামের ইতিবৃত্ত মানবজাতির মুক্তি সাধনার ইতিবৃত্ত। অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোকের সংগ্রামের ইতিবৃত্ত। এই ইতিবৃত্তের মধ্যে তাহার জাতীয় জীবন, শিক্ষা-সভ্যতা, সুখ-দুঃখ ও গৌরবের প্রকৃত পরিচয় ও আশা-আকাঙ্খক্ষা সবকিছুই নিহিত। সুতরাং ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়নকালে এই মূল সত্যটি স্মরণ রাখিতে হইবে।" (খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, রচনাবলী ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৪২৫)। তিনি এটাও বলেছেন– "যদি একটি দেশে কোনো একটি রোগের প্রভাব বেশি দেখা যায়, তবে সে রোগের ধারণা ও প্রতিরোধের উপায়ও পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হইবে।" (খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ও তার কর্মসাধনা, পৃষ্ঠা: ৩৩)।

শিক্ষাস্থল: একটি মানবশিশু জন্মের পর সে সমাজের উপযুক্ত হয়ে গড়ে ওঠার জন্য শরীর, মন ও আত্মা– এই ত্রিবিধ শক্তির সম্যক বিকাশের জন্য যথাযথ শিক্ষার প্রয়োজন। আর সেই শিক্ষার জন্য শিক্ষাস্থল হবে মূলত ১.গৃহ, ২.বিদ্যালয়, ৩.ধর্মশালা। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন– 'গৃহ হল শিক্ষার ভিত্তিস্থান। কেবল গৃহে শিক্ষার পরিপক্কতা জন্মিতে পারে না বলিয়াই বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা, একটি অপরটির পরিপূরক।' 'গৃহ-শিক্ষার উপর চরিত্র-গঠন অনেকাংশে নির্ভর করে। মাতা-পিতার প্রভাবে পুত্র-কন্যার চরিত্র যেরূপ সহজে গঠিত হয়, অপরের প্রভাবে তদ্রূপ হয় না'। (ছুফী খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পৃষ্ঠা: ৭২৪)। গৃহ থেকেই মানুষের মূল্যবোধ তৈরি হয়। যার আলোকে গড়ে ওঠে বিবেক; গড়ে উঠে তার চেতনা; গড়ে ওঠে তার শক্তি। তদুপরি গৃহে শিক্ষা পরিপূর্ণতা লাভ করে না। একজন মানুষের মানবীয় সত্তার বিকাশের জন্য বিদ্যালয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম হবে বহুমুখী, যাতে ব্যক্তিসত্তার বহুমুখী বিকাশের সহায়ক হয়। আবার নানামুখী প্রতিভা সম্পর্কিত মানুষের প্রত্যেকের নিজস্ব প্রতিভা বিকাশের সুব্যবস্থা থাকবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। বিদ্যালয় হবে মানুষ তৈরির কারখানা। মানুষ তৈরির জন্য সব আয়োজনের সমন্বয় ঘটবে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে।

শিক্ষা ব্যবস্থার একই ধারা: বর্তমানে আমাদের দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বহুবিধ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। জাতীয় স্বার্থ বিবেচনা করে একই ধারা আনতে পারলে দেশ বিশেষভাবে উপকৃত হবে। হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) শিক্ষার ধারা প্রসংগে তিনি বলেছেন- "একই সাথে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকলে সমগ্রতা ও একাগ্রতা অনুধাবনে অসুবিধা হয়। উচ্চ শিক্ষার সুবিধার্থে প্রয়োজন শিক্ষা ব্যবস্থাকে একই ধারায় আনয়ন"। (খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ও তার কর্মসাধনা, পৃষ্ঠা: ৩৭)। তিনি মাদ্রাসা এবং স্কুল এই দুই ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় করে একটি ধারা প্রবর্তনের কথা লিখেছেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন: "ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের" প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন মিশন প্রতিষ্ঠাতা শাহ সুফি হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)। তিনি শিক্ষা কর্মসূচিকে প্রাথমিক সোপান হিসেবে গ্রহণ করেন। ২য় দশকে সরকারি সহায়তায় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের পাশাপাশি কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। এভাবে কার্যক্রম সম্প্রসারিত হতে থাকে। তিনি মনে করেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হবে আদর্শ নকশা অনুযায়ী। শিক্ষা উপযোগী আসবাবপত্র ও উপকরণাদির সুব্যবস্থা থাকবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। মুক্ত জ্ঞানচর্চা ও বিকাশের জন্য থাকবে সংগঠিত লাইব্রেরি এবং মিউজিয়াম। ছাত্রনিবাস চলবে সুনির্দিষ্ট নিয়মে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মানুষের মধ্যে মানবিকতার বিকাশ ঘটাবে। পৃথিবীতে অবস্থানরত বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি, সৌহার্দ ও সহমর্মিতা গড়ে তুলতে সহযোগিতা করবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে 'মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মূল দায়িত্ব, পরীক্ষার্থী হিসাবে গড়ে তোলা নয়।'

শিক্ষার জন্য সমাজের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন। তিনি মনে করেন– সমাজ যত উন্নত হবে, শিক্ষার জন্য তত অনুকূল হবে। শিক্ষার সঙ্গে বাহ্য সমাজের সম্বন্ধ অতিঘনিষ্ঠ। কারণ শিক্ষাবহুল দেশে খুব দ্রুত মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটে। তাই সমাজের অবস্থাকে একবার কাম্য স্তরে পৌঁছাতে পারলে সমাজ নিজেই সহায়তা করবে শিক্ষাব্যবস্থাকে এগিয়ে নিতে। শহরের বস্তি এলাকায় দরিদ্র শিশুদের জন্য সান্ধ্যকালীন স্কুল কার্যক্রম ছিলো মিশনের প্রধান শিক্ষা কার্যক্রম। ১৯৮৪ সনের দিকে মিশনের শিক্ষা কার্যক্রমের পরিসর বৃদ্ধি পায় টঙ্গীতে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে।

শিক্ষা ব্যবস্থাপনা: হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর মতে, "শিক্ষাপদ্ধতি এমন হবে, যাতে মানুষের ক্রিয়াশীলতা জন্মায়, মানসিক শক্তি পরিপুষ্ট হয়, যাতে জ্ঞান অন্বেষণ ও সুপ্ত শক্তি বিকাশের ধারা সূচিত হয়, জ্ঞানলিপ্সাকে বর্ধিত করে, প্রত্যেকের আত্মবলম্বন শক্তি পূর্ণভাবে প্রদীপ্ত হয়"। তিনি মনে করতেন, "পরীক্ষায় কৃতকার্যতা কোনো শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। প্রকৃষ্ট প্রণালী দ্বারা শিক্ষা দিলে জ্ঞান ও শক্তি উভয়ের পূর্ণতা লাভ হইতে পারে।" (খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৪২৬)। হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) শিক্ষাসংক্রান্ত চিন্তা চেতনা সন্নিবেশিত হয়েছে তার 'শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মুছলমান' প্রবন্ধ পুস্তকে (১৯১৮) এবং 'টিচার্স ম্যানুয়েল' গ্রন্থে (১৯১৫)।

তাঁর প্রচেষ্টায় বহু মক্তব, মাদ্রাসা, হাইস্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি শিক্ষার মান উন্নয়ন, শিক্ষকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মাদ্রাসা পাশ ছাত্রদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি করেন। আরবি শিক্ষার মধ্যস্থতায় ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, উর্দু সংস্কৃতির স্থান দখল করা। মেধাবি মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তির আনুপাতিক সংখ্যা নির্ধারণ করা, মুসলমান কর্মচারিদের আনুপাতিক হার নির্ধারণ করা, কমিটিতে আসন নির্ধারণ করা হয়।

শিক্ষা কারিকুলাম ও শিক্ষা উপকরণ: শিক্ষাকে সহজ ও আধুনিক করার জন্য শিক্ষানীতি, সহজ পাঠদান পদ্ধতি এবং পাঠ্যপুস্তক প্রয়োজন। আধুনিক, বিজ্ঞান সম্মত আর সহজ পদ্ধতির শিক্ষাদানের জন্য ১৯১৫ সালে তিনি টিচারর্স ম্যানুয়েল রচনা করেন। ষোড়শ অধ্যায়ে বিভক্ত বইটিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য, সাহিত্য, পাটিগণিত শিক্ষা, ভূগোল শিক্ষা, ইতিহাস, জ্যামিতি, কিন্ডারগার্টেন, বস্তু পাঠ, প্রকৃতি ও বিজ্ঞান, ড্রিল, ড্রইং ও হাতের কাজ, ছাত্রদের স্বাস্থ্য, ছাত্রদের চরিত্র, শিক্ষাদানের সাধারণ সূত্র, ইংরেজি শিক্ষার প্রণালি, নীতি ও ধর্মশিক্ষা এবং চরিত্র গঠন, শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান, পরিশিষ্ট এবং সর্বোপরি স্কুল গৃহনির্মাণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

ধর্ম শিক্ষার উপর গুরুত্ব: তিনি ধর্মকে শিক্ষার ভিত হিসেবে বিবেচনায় নিয়েছেন। তাঁর মতে– শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে ধর্মালোচনা হবে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ছাত্রদের মনেপ্রাণে খোদার প্রতি এবং সমগ্র মানবতার প্রতি ভালোবাসা জন্মাতে হবে। বিদ্যালয় থেকে ইসলামের নীতিসমূহ জানাতে হবে। প্রত্যেকেই সমাজের একজন গুরুত্বপূর্ণ (ংবভঁষ) সদস্যে পরিণত হতে সক্ষম হবে। তারা সমাজে সুখ-সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য সর্বদা থাকবে সচেষ্ট। একজন মানুষ হিসেবে বিকাশ লাভের জন্য নৈতিক চরিত্র গঠিত হওয়া প্রয়োজন। ধর্মশিক্ষার মাধ্যমে এই নৈতিক চরিত্র গঠিত হয়। প্রত্যেক স্কুলে ধর্মশিক্ষার পাশাপাশি নামাজ থাকবে ব্যধ্যতামূলক। খোদাবিহীন শিক্ষায় দীর্ঘমেয়াদি চাহিদা পূরণ করা অসম্ভব। ধর্ম ও অসাম্প্রদায়িক শিক্ষা পাশাপাশি চলবে। তিনি লিখেছেন– "সমগ্র মানব সমাজে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের মহান দায়িত্ব নিয়ে আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠিত।" (খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৬২৯)। মিশন প্রতিষ্ঠাতার আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের আদর্শ প্রচার ও প্রসার হচ্ছে আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজমের মাধ্যমে।

নীতিশিক্ষা ও চরিত্র গঠন: নীতিশিক্ষা ও চরিত্র গঠন প্রসঙ্গে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) মনে করতেন, চরিত্রই মানবের সর্বপ্রধান সম্পদ। একজন মানবের জন্য প্রয়োজন নিষ্কলঙ্ক ও পূর্ণাঙ্গ চরিত্র গঠন। তার জন্য শিক্ষাই একমাত্র হাতিয়ার। তাই প্রয়োজন নীতিশিক্ষাকে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে মানবের চরিত্র গঠন করা। পাশাপাশি থাকবে বাস্তব জীবনের আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি তত্ত্বগত শিক্ষার ব্যবস্থা। একই সঙ্গে অর্জিত হবে ন্যায়ানুষ্ঠানের অভ্যাস। তিনি লিখেছেন– 'বালক-বালিকার হৃদয়েই সু ও কু-র বীজ নিহিত থাকে। গুরুজন যত্নপূর্বক সুপ্রবৃত্তিগুলির আচরণ ও কুপ্রবৃত্তিগুলির অনাচরণ দ্বারা একের পুষ্টি ও উৎকর্ষ এবং অপরের দমন সাধন করিবেন। ইহা এক দিনের কার্য্য নহে। ইহা বড় কঠিন যোগ।' ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি পাঠ্যসূচির মধ্যে জীবন গঠনমূলক নীতি ও উপদেশ অন্তর্ভূক্ত থাকবে। তবে এই শিক্ষা বাস্তবায়ন 'শিক্ষকের যোগ্যতা, তাহার ব্যক্তিত্ব এবং নৈতিক শক্তি ও সূক্ষ্মদর্শনের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।' 'মানবাত্মা পরমাত্মা থেকে আগত, পরমাত্মার সহিত পুনঃমিলনই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য।' অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ, পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের এই চরম লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রথম ধাপ চরিত্র গঠন। আর এই চরিত্র গঠনের জন্য নীতিশিক্ষা অপরিহার্য। তাই ধর্ম নির্বিশেষে সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের হৃদয়ে ধর্মভাবের উদ্রেক করা ও নীতিশিক্ষা দেওয়া প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর একান্ত কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন– 'মানব প্রেম– সকল ধর্মের প্রধান স্তম্ভ। স্রষ্টার প্রতি অনুরাগ জন্মিলে সৃষ্টের প্রতি ভালবাসা স্বভাবতঃই জন্মে। সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস আসিলে পাপের ভীতি ও পুণ্যের আকর্ষণ জন্মে। উহার ফলে ধর্মের অনুরাগ ও চরিত্র গঠিত হয়। শিক্ষক ধর্মপরায়ণ হইলে তাহার প্রভাব ছাত্রদিগের উপর সুফলপ্রসূ হয়।' (আমার জীবন-ধারা, পৃষ্ঠা: ৪৮)।

শিক্ষা সংস্কারক: শিক্ষাবিদ হিসেবে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্কার সাধন করে গেছেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেটের সদস্য নির্বাচিত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার খসড়া বিল সিনেটে উপস্থাপিত হলে বিলটি প্রচণ্ড বিরোধের সম্মুখীন হয়। এই বিরোধ মেটাতে একটি কমিটি গঠন করা হয়। তিনি এই কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা উপস্থাপন করেন। তিনি উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে সমতার ফলাফল পেতে পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীর নাম লেখার পরিবর্তে ক্রমিক নম্বর লেখার রীতি চালু করতে সক্ষম হন। সমাজের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় সাধারণ বিষয়গুলো, যেমন– ভাষা-সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ধর্ম ইত্যাদি বিষয় পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে তাঁর ছিলো অভিন্ন অভিমত। প্রতিটি বিষয় নির্বাচন, পাঠ্যসূচি নির্বাচন, পাঠ্যপুস্তক রচনা, পাঠদান পদ্ধতি সবই লক্ষ্যমুখীকরণের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি।

নারী শিক্ষা: পৃথিবীর সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। পুরুষের শিক্ষার প্রতি যেমন গুরুত্ব দেওয়া উচিত নারী শিক্ষার প্রতিও তদ্রুপ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। শিক্ষা নারীদের সুগৃহিনী হিসেবে গড়ে তুলবে। স্ত্রীজাতি সম্পর্কে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)'র 'মোছলেমের নিত্য জ্ঞাতব্য' গ্রন্থে বলেছেন "খোদার অভিপ্রেত নহে যে, মানব-জাতির অর্দ্ধাংশ অন্তপুরে আবদ্ধ থাকিয়া কেবল গার্হস্থ্য কার্যে নিয়োজিত থাকিবে। তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে, পুরুষের কার্যে সহায়তা করিতে হইবে, সওদাপত্র করিতে হইবে, শিক্ষয়িত্রীর কার্যকরিতে হইবে, রাজনীতি ক্ষেত্রে যোগদান করিতে হইবে, শাসন বিভাগে অংশী হইতে হইবে, দেশ রক্ষার জন্য সহায়তা করিতে হইবে।" (মোছলেমের নিত্য-জ্ঞাতব্য, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পৃষ্ঠা: ২৪০)। "স্বাধীনতার অর্থ ইহা নয় যে, স্বামীর প্রভূত্বের বেড়ী অতিক্রম করিবে, কিংবা নিজেকে অপর পুরুষ দ্বারা প্রলুব্ধ হইবার সুযোগ দিবে"। (মোছলেমের নিত্য-জ্ঞাতব্য, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পৃষ্ঠা: ২৪১)। তিনি আরও উল্লেখ করেন "পর্দ্দার উদ্দেশ্য সতীত্ব রক্ষা। নারীর চরিত্র নির্ভর করে তাহার শিক্ষার উপর, স্বামীর নিয়ন্ত্রণের উপর, পারিপার্শ্বিকতার উপর। সারা দিবারাত্র কেবল কারাবদ্ধ থাকিলে তাহার মনোবৃত্তির প্রসার হয় না। কর্ম্মশক্তি ও বিচার শক্তির উন্মেষ হয় না। আত্মার স্ফুরণ চাই, মহিলা সমাজের

সংস্পর্শ চাই, প্রাকৃতিক রহস্যের তফক্কোর চাই।" (মোছলেমের নিত্য-জ্ঞাতব্য, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পৃষ্ঠা: ২৪৩)।

উপসংহার: পরিসীমিত মন্তব্যে বলা যায়, আদর্শ শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা সংস্কারক হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)'র বহুকাল আগে দেওয়া শিক্ষা নির্দেশনা অনুসরণ করে এখনো যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অতি সহজেই তাদের কাঙ্খিত সাফল্যে সমর্থ হতে পারে। শিশুরাও খুঁজেপেতে পারে তাদের সাফল্যের সিঁড়ি। আসুন, আমরা সবাই খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) নির্দেশিত পথে এগিয়ে যাই। সু-শিক্ষা, সু-শাসন ও সু-ব্যবস্থাপনা প্রসারে ব্রতী হই।

তথ্যসূত্র: (হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রহ. রচিত গ্রন্থসমূহ)

১. 'খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, রচনাবলী ৮ম খন্ড'
২. 'খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ও তার কর্মসাধনা'
৩. 'ছুফী খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা'
৪. 'আমার জীবন-ধারা'
৫. 'মোছলেমের নিত্য-জ্ঞাতব্য, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা'

গবেষণা ও গ্রন্থনা:

মোঃ সাহিদুল ইসলাম
হেড অব এডুকেশন প্রোগ্রামস, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

প্রশান্ত ডেভিড সাধুখাঁ
প্রকল্প সমন্বয়কারী, ইউসিএলসি প্রকল্প, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

শেখ মহব্বত হোসেন
প্রকল্প সমন্বয়কারী, ড্রপ-ইন-সেন্টার প্রকল্প, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

* ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ৬০ বছর পূর্তিতে হীরক-জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে গবেষণা প্রকল্পের আধীনে অনুষ্ঠিত অষ্টম সেমিনারে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ রোজ শনিবার বিকাল ৩ ঘটিকায় মিশন মিলনায়তনে উপস্থাপিত।